সাহিত্যিক মুলক রাজ আনন্দের লেখা একটি গল্পের কথা মনে পড়ে গেল । একটি ছোটো ছেলে তার মায়ের হাত ধরে গাঁয়ের মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে । দেখে পসারীদের কাছে হরেক রকমের পসরা । বেলুনওয়ালার লাঠির ডগায় পতপত করে উড়ছে রঙবেরঙের বেলুন, টুপীওয়ালার দুহাত ভরা সারি সারি নক্সা টুপী, মিঠাইওয়ালার সামনে সাজান স্তুপিকৃত জিভে জল আনার খাবার । ছেলে বায়না জোড়ে ''সব আমার চাই'' । তার মা বড্ড গরিব, রকমারি সব পসরার ভিতর থেকে কোন একটি কিনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই ।সে ছেলের মন ভোলাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে । অবুঝ বালক বোঝে না । রাগ করে মায়ের হাত ছাড়িয়ে হনহন করে হাঁটা দেয় । একসময় খেয়াল হয় আশেপাশে কোথাও মা নেই । 'মা মা' বলতে বলতে দিশেহারা বালক, উদভ্রান্তের মত ছুটতে থাকে । বেলুনওয়ালা ছুটে এসে তাকে বেলুন দিতে যায়, টুপীওয়ালা এগিয়ে দেয় নক্সাকাটা টুপী, মিঠাইওয়ালা তার মুঠোয় ভরে দেয় মিষ্টি । শিশুর কান্না থামে না । সে এখন চায় শুধু তার মাকে ।

ঐ বালকের সাথে আমার অদ্ভুত মিল । ওর মত আমিও ভীনদেশের মাটিতে আরাম আতিশয্য আর বৈভবের মধ্যে তোলপাড় করে খুঁজে চলেছি আমার মাকে । আমার মাতৃভুমি, মাতৃভাষা, আমার দেশের আত্মজের ঘ্রান । বিদ্যাশিক্ষা অর্জনের পর আমার ঝুলিতে এখন অনেক ডিগ্রী কিন্তু নিজের উপলব্ধি দিয়ে শেখা জ্ঞানের কাছে এগুলো মূল্যহীন । ''তত্ত্বজ্ঞান কপচিও না শুধু বল তুমি কি জান ।'' এই জানা কিন্তু শুধু মাত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে । অভিঞ্জতা ব্যক্তিগত । বিখ্যাত মনস্তত্ববিদ কর্ল রজার্স বলতেন, ''যে জিনিস আমরা সবচেয়ে ব্যক্তিগত মনে করি তা আসলে সর্বসাধারনের জন্য ।'' তাই আমার যে অভিজ্ঞতার কাহিনী আজ শোনাব তার নায়ক আমি নই, এই সমাজ আর মানুষ । দেশ, কাল ব্যতিরেকে এই মানুষ পৃথিবীর যে কোন স্থানের হতে পারে । তবে আমার গল্পটি ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র রাজ্যের একটি ছোট গ্রাম, গাদচিরোলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা । গল্পটি যাদের কাছে বলছি সেই ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষজন ভুলে যান ঘটনাস্থানের কথা । মনে রাখুন শুধু গল্পের নায়ক নায়িকাদের । এদের সাথে নিজের মিল আপনারা একসময় না একসময় খুঁজে পাবেনই ।

আমার বাল্যকাল কাটে গান্ধিজীর সেবাগ্রাম আশ্রমে । আজ কর্মসূত্রে আমার বাসভবন সোধগ্রামে; (এই নামটি আমাদের দেওয়া) । তাই আমার গল্পের নাম 'সেবাগ্রাম থেকে সোধগ্রাম ।' আমার জন্মের আগে থেকে আমার পরিবার গান্ধিজীর আদর্শে এবং স্বর্গীয় শ্রী জমুনালাল বাজাজের অভিবাভকত্বে বর্ধিত হয়েছে । গান্ধিজীর কলেজজীবন শুরু হয় ওয়ার্ধায় । সেসময় ওয়ার্ধার এই কলেজটি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে অগ্রনীভূমিকায় ছিল । আমার বাবা যখন নাগপুর ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরোলেন তখন তাঁর ঝুলিতে পাঁচখানা সোনার মেডেল । যমুনালালজী সদ্যপাশ করা এই তরুণ গোল্ড মেডেলিস্টকে অর্থনীতির প্রফেসর পদে নিয়োগ করলেন । তখন ১৯৪২ সাল, দেশজুড়ে বিদেশীপ্রভাব মুক্তির উদ্যোগে ভারতবাসীরা ঘর ছেড়ে নেমে এসেছে পথে । ঐ বছর বাবা জেলে গেলেন । ছাড়া পেলেন ১৯৪৫ সালে । সারা দেশ তখন স্বাধীনতার দিন গুনছে । বাবা ভেবেছিলেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা

গ্রহণের পর স্বাধীন ভারতে তাঁর কাজ শুরু করবেন। ঠিক এইসময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াহিও ইউনিভার্সিটি থেকে একটা স্কলারশিপেও জুটে গেল। যাওয়ার আগে তিনি গেলেন বাপুজীর সাথে দেখা করতে। সব শুনে গান্ধিজী সেদিন মাত্র একটি কথা বলেছিলেন, ''যদি সত্যিই তুমি অর্থনীতিতে আরও জ্ঞনার্জন করতে চাও তবে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে যাও।'' গান্ধিজীর মুখনিঃসৃত সেই বাক্য বাবার জীবন বদলে দিল। গান্ধী কুটিরের বাইরে এসে বিনাদ্বিধায় ছিঁড়ে ফেললেন আমেরিকা যাওয়ার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। মাসখানেকের মধ্যে দশ বারোজন ছাত্র নিয়ে গেলেন ওয়ার্ধার কাছাকাছি একটি গ্রামে। সেখানে চাষাভূষোর মত চাষবাস করতে করতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে জ্ঞানার্জন করলেন। আজ পঞ্চান্ন বছর পর প্রায় তিরাশি বছরের সেই স্বতস্ফুর্ত যুবক একই উদ্দীপনা ও আনন্দ নিয়ে গান্ধী উৎসাহিত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন।

গান্ধিজী কি ম্যাজিক জানতেন? নাহলে তাঁর এক কথায় এই উচ্চাকাঙ্খী মেধাবী যুবকটি এতবড় প্রলোভন হেলায় ফিরিয়ে দেয় কিভাবে। ম্যাজিক মন্ত্র তাঁর জানা ছিল বটে তবে তা ছিল তাঁর অন্তরাত্মা, কারণ সারা জীবন ধরে এই এক ম্যাজিক তিনি নিজের উপর প্রয়োগ করে এসেছেন ''যা বলেছ তা নিজে করে দেখাও।'' আমেদাবাদ থেকে ওয়ার্ধা আসার পর খ্যাতমান এই ব্যারিস্টার মহোদয় স্বেচ্ছায় গ্রামে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। সেগভ নামের সেই গ্রাম 'সেবাগ্রাম' এ রূপান্তরিত হয়ে তাঁর কর্মভূমির পুণ্য অর্জন করল। তাই সেবাগ্রামের সেই কুটিরে একটি মাটির উপর শুয়ে কর্মপুণ্যাত্মার বাণী, বাবার দিকে ব্রহ্মাস্ত্রের মত ধাবিত হল। তাঁর কথা ও কাজের ভিতর এতটুকু অমিল ছিল না। মহাত্মার সমস্ত শক্তি নিহিত ছিল তাঁর কর্মযোগে। এই সেবাগ্রামে আমার শৈশব একটু একটু করে বেড়ে চলল।

আমার বড় হতে থাকার সময়টাতে গান্ধিজী জীবিত ছিলেন না কিন্তু তাঁর উপস্থিতি ছিল সর্বত্র। মাটি-বাঁশের তৈরী আশ্রমের প্রার্থনাগৃহে, খাদি তৈরীর কবীর ভবনে, মাঠ, গোশালায়, কুষ্টাশ্রমে এবং গান্ধিজী - কবিগুরুর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্টিত বিদ্যালয়টিতেও তাঁর ছোঁয়া। এই বিদ্যালয়ে আমি পড়াশুনা করেছি। এটির নাম খুব অর্থবোধক, 'নয়ী তালিম', অর্থাৎ নব প্রশিক্ষণ। আমার মা ছিলেন স্কুলটির অধ্যক্ষা। স্কুলটি বছরে 'ভুদান যাত্রার' দিন বন্ধ থাকত। বিনোবা ভাবেজীর হাত ধরে আমরা পায়ে হেঁটে চাষীদের কাছে আবেদন করতাম গাঁয়ের শস্যভাণ্ডার তৈরী করতে তারা প্রত্যেকে যেন তাদের জমির কিছু অংশ দান করে। একদিন বিনোবা ভাবেকে প্রশ্ন করে বসলাম, ''আপনি যে গাঁয়ের লোকজনকে শস্যভাণ্ডার তৈরীর জন্য জমি দিতে বলছেন, কিন্তু ইঁদুরগুলো যে শস্য খেয়ে নেয় তার কি ব্যবস্থা হবে?'' শুনে উনি খুব হেসেছিলেন।

স্কুলে শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো আনন্দে পার করার পর আমি ভর্তি হলাম মেডিকেল কলেজে। ওখানে প্রথম দিনে এক বন্ধু আমায় ডাইসেকশন হলে এনে ছুরি হাতে একটি অল্প বয়সী মেয়েকে দেখিয়ে বলে, ''এর নাম রানী চারি, এসেছে চন্দ্রপুর থেকে। গত বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। এ বছর তুমি প্রথম। জমবে ভালো''। বন্ধুত্বের সেই

শুরু । ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও রানী সাধারন ভাবে থাকে. আমাদের স্বপ্ন একই পথে চলেছে । এম ডি পাশ করে দুজনে বিয়ে করলাম । বিয়ের পর ওয়ার্ধার আশেপাশে গ্রামগুলোতে কাজ শুরু করি । ১৯৭৮ সালে জরুরী অবস্থার শেষে জয়প্রকাশজীর নতুন সমাজ গড়ার ডাকে তরুন যুবার দল টগবগে উত্তেজনায় গ্রামীন ভারত সেবায় ব্রতী হচ্ছে । আমরা সমাজ এবং স্বাস্থের উন্নতির যৌথ স্বপ্ন চোখে নিয়ে এলাম ওয়ার্ধার কাছে কানহাপুরে ।ঐ গ্রামে প্রায় তিনবছর গরীব চাষীদের চিকিৎসা করি । একদিন সে গ্রামে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায় । আজবরাও ইভান্তে নামে এক জনমজুরের একটি হাত ধান পেষাই কলে পিষ্ট হয়ে গেল । তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে হাতখানি কেটে বাদ দিতে হয় । সেরে ওঠার পর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় । আমরা বুঝলাম শুধু ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, ওষুধ লাগিয়ে রোগী সুস্থ করে তুললে দায়িত্ব শেষ হয় না । আজবরাওয়ের মালিকের কাছে তিন বিঘে জমি অনুদান হিসেবে চাওয়া হল । কান্হাপুরের প্রায় সমস্ত চাষী এই আবেদন খারিজ করে । তাদের মতে ওকে জমি দিলে পরবর্তী কালে সমস্ত আহত জনমজুরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । আমরা জনসভার আয়োজন করি । সাধারণত আমাদের জনসভায় শয়ে শয়ে লোক উপস্থিত থাকে । সেদিন রাত্রে মাত্র তিনজন এল । সবেমাত্র মাইক্রোফোন হাতে বলতে শুরু করেছি, আশপাশের বাড়ী থেকে পাথর ছোঁড়া শুরু হল । গত তিন বছর যাদের সাধ্যমত চিকিৎসা করেছি তারা আজ এভাবে প্রতিদান দেবে ভাবতে পারিনি । ডিসেম্বরের মধ্যরাতে ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে আমরা কান্হাপুর ছাড়লাম । বুঝলাম শুধু শারীরিক চিকিৎসায় গ্রামের অসুবিধা দুর হবে না । কিভাবে তা সম্ভব? কান্হাপুরের কোন ভুলের মাশুল গুনতে হয়েছিল? কারণ খুঁজতে বসে একটি কথা বারংবার মনে হয় । ভারতবর্ষে রোগ নিরাময়ের উপর বেশিরভাগ গবেষণা বিদেশী মহাত্মারা করে গেছেন । মশা বাহিত রোগ ম্যালেরিয়া, এ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করলেন ব্রিটিশ ডাক্তার রোনাল্ড রস । ভারতে এসে রোগের কারণ ও নিরাময়ের উপায় আবিষ্কার করলেন । কলেরা রোগ ভিব্রিও কলেরি জীবাণু থেকে হয় । ইওরোপের রবার্ট কক ভারতবর্ষের আটিতে এই তথ্য আবিষ্কার করেন । কিন্তু দেশের বেশীরভাগ চিকিৎসক গ্রামে থাকতে চান না । আর গ্রামেই রোগ জীবানুর আখড়া । গ্রামীণ চিকিৎসা নিয়ে গবেষণার নিয়মবিধি জানতে আমরা বাল্টিমোরে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই । আমাদের মূল লক্ষ্য লোকস্বাস্থ্য বিষয়ে পড়াশুনা । ডলার সম্পদের মত আমেরিকা জ্ঞান সম্পদেও ধনী । প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করে স্থির করি দেশে ফিরে যাব । ফেরার আগের দিন প্রফেসর কার্ল টেলার জিজ্ঞাসা করলেন, ''দেশের জন্য কি কি নিয়ে যাচ্ছ?''
উত্তরে জানাই স্তুপাকৃত বই, ব্যাগ ভর্তি রিসার্চ পেপার এবং স্লাইড প্রোজেক্টর । গ্রামের মানুষগুলোকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে না ।

ভারতের প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রাম রোগের প্রকোপে এবং মড়কে জর্জরিত । বাঁচবার রাস্তা কি? কোত্থেকে শুরু করব? কোথায় থাকব? বম্বে, দিল্লী, পুণের বড় বড় গবেষনা প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রন এল । ভেবে দেখলাম এই প্রতিষ্টানগুলি গ্রাম থেকে বহুদুরে, এখানে বসে কাজ করলে তা কি গ্রামের অসহায় মানুষগুলির কাছে পোঁছাবে? এই অস্থির অবস্থা থেকে মুক্তি দিল আমার ছেলের স্কুল পাঠ্যের একটি ছোটো গল্প । একবার সম্রাট আকবর বীরবলকে রাজ্যের অন্তত দশজন বোকা ব্যাক্তি খুঁজে আনতে হুকুম করেন । বীরবল খুঁজে খুঁজে নজন বোকা পেলেন । দশম ব্যক্তিকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন । একদিন দিল্লীর সুরম্য সড়কে তিনি পায়চারী

করছেন । দেখেন অন্ধকার ঘুটঘুটে রাস্তায় কেবলমাত্র একটি ঘরে জানলা দিয়ে একটু আলো চুঁইয়ে পড়ছে । একটি লোক ঘরের আশেপাশে কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে । বীরবল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কি খুঁজছ?''

লোকটি উত্তর দেয়, ''একটি হীরের আঙটি হারিয়ে গেছে কিছুতেই পাচ্ছি না ।''

''হুম ।'' কোথায় হারিয়েছ ?''

''যমুনা নদীর ধারে ।''

''তাহলে সেখানে যাও খুঁজে পাবে ।''

''ওখানে তো অন্ধকার । এখানে আলো আছে খুঁজতে সুবিধা ।''

বীরবল বোকা সদস্য তালিকা সম্পূর্ণ হল । আমাদের দেশের চিকিৎসা গবেষণাগারগুলো গল্পের সেই বোকা লোকটির ঘরের মত । জ্ঞানের আলো কাছে কিন্তু দরিদ্র অসহায় গ্রামবাসীদের কাছে তা পৌঁছাতে পারে না । গল্পটি আমার চিন্তার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় । আমাদের কর্মক্ষেত্র হয় গাদচিরলি জেলা ।

১৯৮২ সালে চন্দ্রপুর জেলা ভেঙে গাদচিরোলি নামে আদিবাসীদের জন্যে একটি পৃথক জেলা তৈরী হয় । এটি মহারাষ্ট্রের পূর্বে অবস্থিত মধ্য প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশ দিয়ে ঘেরা । নাগপুর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণে শতকরা ষাট ভাগ জঙ্গলে ভরা এই জেলার পশ্চিম উপকূল বেয়ে বয়ে চলেছে বেনগঙ্গা নদী । বর্ষায় নদীর জল বাড়লে ছোটখাট নালা বিল ভরে ওঠে । বন্যায় খেত, খামার, রাস্তা সব ভেসে যায় । এখানকার বেশীরভাগ মানুষ চাষী । তবে চাষাবাদ হয় বছরের মধ্যে চার মাস । বাকি দিনগুলোয় কাঠ কেটে, মহুয়া, পলাশ বিচুলি সংগ্রহ করে জীবনধারণের কাজ চলে । এ জেলায় প্রায় আশি শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে । একদিন মাঠে এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করি, ''ওখানে কি করছ?'' উত্তরে জানায় ঘাসের বীজ আর ফুল সংগ্রহ করছে । তার ঘরে এককণা খাবার নেই । একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আজও মানুষ ঘাসবীজ সিদ্ধ খেয়ে জীবন কাটায়! বছরের একমাস আবার সেটুকুও জোটে না । খালি পেটে ঘুমোতে হয় । এই মাস হাদুক নামে পরিচিত । জেলার চল্লিশ শতাংশ মানুষ মাদিয়া গণ্ড উপজাতির অন্তর্ভুক্ত । ঘরবাড়ির গায়ে আদিবাসী জীবন যাত্রার চিত্র আঁকা । অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার এখানে বাতাসে ছুঁয়ে আছে । অসুখে হলে তারা ওঝা, মাড়াইদের কাছে যায় । গোদেবতা দেবীর কাছে মানত করে । গ্রামের বাইরে মহুয়া গাছের তলায় কাঠের বিগ্রহ । জঙ্গলে একটি কুঁড়েঘর আছে । রজস্বলা মহিলারা ঋতুকালীন সময়ে ঘরটিতে থাকেন । এখানকার একমাত্র বাহন গরুরগাড়ি । নদীর ওপরে সেতু তৈরীর কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় বহুকাল বন্ধ । বর্ষায় গ্রামটি নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । ১৯৮৬ সালে রাণীকে নিয়ে সেখানে যাই । গ্রামবাসীরা পরম যত্নে পলাশ পাতা সঞ্চয়গৃহে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে । দরজার বাইরে ইংরেজী অক্ষরে বড় বড় করে লিখলাম, ''সার্চ'' । সেখানে যাওয়ার এক মাস পরে প্রচণ্ড বন্যায় গ্রামের রাস্তাঘাট ডুবে গেল । প্রায় সাত দিন পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সব্জি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া কাটিয়ে দিলাম । সার্চে আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা ।

কানহাপুরের অভিজ্ঞতায় শিক্ষা পেলাম শরীরজনিত সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষের উপর আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়া যায় না । গাদচিরলির গ্রামে আমরা প্রথমেই তাদের অসুবিধার কথা তাদের মুখ থেকে শুনতে চাইলাম, তাদের শরীরজনিত সমস্যা কি ? আমরা এ ব্যাপারে কি করতে পারি? লক্ষ্য করলাম এই সমস্ত আলোচনায় গ্রামের নেতা বা মুখিয়ারা এগিয়ে আসে, জনসাধারণ বসে থাকে নীরবে, দূরে । শেষপর্যন্ত এই ধরনের পোশাকি জমায়েত বন্ধ করা হল । রাতের অন্ধকারে কাঠ, শুকনো পাতা, খড় জ্বালানো গরম জায়গায় নিভৃতে হতে লাগল আমাদের আলোচোনা । এমন একটা পরিবেশে আদিবাসীরা অনেক স্বচ্ছন্দে তাদের সমস্যা জানাতে শুরু করল । এমন আলাপ আলোচোনার আসর অন্তত চল্লিশটি গ্রামে বসানো হল । তাদের সমস্যার কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, ''এমন দুরবস্থার মধ্যে আছ হাসপাতালে যাও না কেন?''

''আমাদের ভয় করে ।''

''ভয়? কেন?''

''ভয়ের কারণ কি আর একটা! হাসপাতালের বড়বড় বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় ওর কোন একটা তলায় যদি আমরা হারিয়ে যাই ।ডাক্তার নার্স সাদা পোশাক পরে থাকে । ওদের দেখলেই ভয় হয় ।''

''পোশাক দেখে ভয় পাওয়ার কি আছে?''

''কেউ মারা গেলে তাকে সাদা কাপড়ে মুড়ে কবর দিই । একজন সাদা পোশাকের মানুষ কি করে আমাদের বাঁচাবে?''

''বুঝলাম । আর কোন কোন কারণে তোমরা ভয় পাও?''

''হাসপাতালে যে ভাষায় কথা বলে আমরা তার একবর্ণও বুঝি না । ওদের ওখানে রোগী ভর্তি হলে কাছে থাকতে দেয় না । দেখা করার সময় তিনটে থেকে ছটা । আমরা শ'শ কিলোমিটার দূর থেকে ওখানে যাই । অতদূরে থাকব কোথায়? রোগীরা ভাবে তাদের প্রিয়জনের মাঝে তারা শান্তিতে মরবে ।কিছুদিনের মধ্যে ওরা পালিয়ে যায় ।''

''আর কোন ধরনের ভয় তোমরা পাও?''

''হাসপাতালে ভগবান নেই । যেখানে ঈশ্বর নেই শেখানে মানুষ কিভাবে সুস্থ হবে?''

হাসপাতাল সম্পর্কে আদিবাসীদের ভয় ও দ্বিধা আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায় । এমন একটা পরিবেশে আমাদের হাসপাতাল গড়ে উঠবে যেখানে ওরা ঘরের উষ্ণতা পাবে । সেই মত তৈরী হল আমাদের হাসপাতাল । রোগীর আত্মীয়স্বজনদের জন্য প্রতীক্ষা ঘর তৈরী হল । গণ্ডদের গ্রামে অতিথিদের থাকার জন্যে ঘোটুল নামে কুঁড়ে থাকে ।বিকেলের দিকে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সেখানে নাচ, গান শেখে । আমাদের হাসপাতালের প্রতীক্ষাগৃহটিও ঘোটুলের মত করেই তৈরী হল । কিন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজনদের তো হাসপাতালে থাকতে দেওয়া যায় না, এই সমস্যা দূর হবে কি করে? সাধারণত হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে চল্লিশজন রোগীর শোয়ার ব্যবস্থা থাকে । ডাক্তার এবং নার্সরা যাতে একসঙ্গে অনেক রোগী দেখতে পায় তাই এই ব্যবস্থা । আমরা যদি এমন হাসপাতাল তৈরী করি যেখানে ছোট ছোট কুঁড়ে গড়ে উঠবে এবং রোগীরা তাদের আত্মীয়দের পাশে থাকবে তবে কেমন হয় । আমাদের এই প্রস্তাবে ওরা সানন্দে রাজী হল । উদেগামের আদিবাসীরা যেচে এসে কুঁড়েঘর বানাতে

শুরু করে । দেখাদেখি অন্যান্য গ্রামের লোকজনও । এক বছরের মধ্যে আমাদের হাসপাতাল কুঁড়ে তৈরী হয়ে গেল ।

হাসপাতালটি ওদের ইচ্ছামত তৈরী হয়েছে, নামটাও ওরাই দিল, ''মা দান্তেশ্বরী হাসপাতাল ।'' তখন আমি সদ্য আমেরিকা ফেরত । এমন একটা নাম আমার পছন্দ হল না । বললাম, ''নতুন কোন নাম দাও ।'' ওরা অনড়, বলে, ''হাসপাতালটা আমাদের তাই নামটাও আমরাই দেব ।'' দান্তেশ্বরী ওদের প্রধান দেবী । ওরা যাতে বিশ্বাস করে যে এই দেবী ওদের হাসপাতালে গিয়ে সুস্থ হতে নির্দেশ দিয়েছেন, ওদের কথা মাথায় রেখে হাসপাতালে ঢোকার মুখে দান্তেশ্বরী দেবীর একটা মন্দির বানালাম । ভর্তি হওয়ার পূর্বে রোগীরা এই মন্দিরে প্রার্থনা করে । অদ্ভুত এদের ভক্তি । যদি ওদের সামনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তুল ধরা হয় বলা হয় জীবাণু থেকে রোগ ছাড়ায় তাহলে ওরা কিছুতেই মানবে না । প্রশ্ন করবে, ''কোথায় জীবাণু? দেখাও তাকে ।'' যদি বলি যে মা দান্তেশ্বরী চাইছেন তোমরা পরিষ্কার থাক ওরা সাথে সাথে তা শোনে । আমাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি দান্তেশ্বরী দেবীর নামে আদিবাসীদের শিক্ষিত করা ।

আমরা দান্তেশ্বরী দেবীর নামে বার্ষিক মেলার আয়োজন করলাম । পঞ্চাশ থেকে ষাটটি আদিবাসী গ্রাম থেকে এই উপলক্ষে লোক জড় হল । তারা নাচল, গাইল এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা আলোচনা সভায় যোগ দিল । বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার দলগুলো নিজেরাই ঠিক করল মানুষের কি ধরনের অসুবিধা এবং কিভাবে তা দূর করা যায় । এই সমস্ত গ্রামগুলিতে প্রধান রোগ হল ম্যালেরিয়া । গ্রামের প্রায় অর্ধেক মানুষ জ্বরে ভোগে, তারা কাজে যেতে পারে না । আমাদের কয়েকটি উপায় জানা আছে তারা এর মধ্যে থেকে একটি বেছে নেয় ।

প্রতিটি গ্রামে একজন করে স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল । মন্দিরের পুজারী, মন্ত্রের সাথে সাথে জড়িবুটি, ওষুধ দেয় তাদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । পুজারীরা প্রশিক্ষণে আসার ফলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব মুক্ত করার জন্য 'সার্চ' এর তরফ থেকে যারা আদিবাসীদের কাছ থেকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত না । গাদচিরোলি আমাদের নবকার্যালয় সেবাগ্রামরূপে পরিণত হল ।

হাসপাতালে প্রতিদিন রুগীর কাছে অসংখ্য মহিলা আসে । রানী স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞা । ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারলেন যে বেশীরভাগ মহিলা স্ত্রীরোগ জনিত কারণে ভুগছে । গর্ভাবস্থা বা প্রসবাবস্থায় তারা রোগের সম্মুখীন তো হয়ই উপরন্তু অন্যান্য হরমোনঘটিত স্ত্রীরোগে তাদের শরীর দুর্বল হয় । স্ত্রীরোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করার আগে দরকার তথ্য নথিভুক্তিকরণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচোনা । আমরা ওয়াশিংটন ন্যাশনাল লাইব্রেরী ঘেঁটে উন্নতিশীল দেশে স্ত্রীরোগগুলির পরিসংখ্যান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না । ওখানে শুধুমাত্র

উন্নত দেশগুলির পরিসংখ্যান দেওয়া হয় । এই ধরনের তথ্য বিশেষ কার্যকরী হবে না । স্থির করি স্ত্রীরোগের হার নিশ্চিত করতে বিশদ সমীক্ষা করব । এর জন্য সর্বপ্রথম গ্রামের সব মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরী । কত সংখ্যক মেয়ে স্ত্রীরোগের শিকার তা জানতে আমরা বিশেষ আগ্রহী । ভাসা এবং আমীজা গ্রাম চায় সর্বপ্রথম তাদের গ্রামের মেয়েদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা হোক । গ্রামদুটিতে প্রবেশ করা মাত্র যেন উৎসবের সাড়া পড়ে গেল । ভাবা যায়! একটি অখ্যাত আদিবাসী গ্রামের মহিলা আদিবাসীদের বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা নিয়ে এত স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি মিলবে? পরবর্তী ছমাসে দেখা গেল প্রায় ৯২ শতাংশ মহিলা স্ত্রীরোগজনিত সমস্যার শিকার । ঘর বা মাঠে কর্মরত মহিলারা জরায়ুর ইনফেকশন, প্রদাহ, ঋতুস্রাবজনিত সমস্যায় ভুগছে । ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিখ্যাত 'ল্যান্সেট' জার্নালে আমাদের সমীক্ষা প্রকাশিত হয় । বিশ্বস্বাস্থ্য পলিসি মেকারদের টনক নড়ে ওঠে । সমীক্ষাটি উন্নয়নশীল দেশের মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এ দশকের অন্যতম সেরা গবেষণা রূপে অভিনন্দিত হয় । এ বিষয়ে আন্তর্যাতিক স্তরে আলোচনা চলে । স্ত্রীরোগজনিত সমস্যা যদি এত তীব্র হয় তবে এইডস রোগ দ্রুত ছড়াতে থাকবে । তখন সারা বিশ্বে মহিলাদের সমস্যা ও দাবী নিয়ে তুলকালাম চলছে । ১৯৯৪ সালে কায়রোতে পলিসি বদলে শুধু জন্মপ্রতিরোধই নয় মহিলাদের জননাঙ্গ জনিত সমস্যা নিবারণও মূল উপপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল । আমাদের এই গবেষণা বিশ্বের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নীতিকে আমূলভাবে প্রভাবিত করল ।

এতো গেল বিশ্বের কথা । কিন্তু গাদচিরোলির কি হবে? বিশ্বের তাবড় ব্যক্তিরা যতই হৈ চৈ ফেলুন না কেন এই জেলার মানুষ কি বদলাবে? কিভাবে? আমরা প্রতিটি আদিবাসীর কাছে স্বাস্থ্যচেতনা পৌঁছে দিতে চাই । ঠিক করি আরও একটি স্বাস্থ্যমেলার আয়োজন করব । আটঘন্টার একটি স্বাস্থ্যচেতনা সম্পর্কিত অনুষ্ঠান এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে প্রচারিত হতে থাকল । স্বল্পভাষী, প্রকাশ বিমুখ মহিলারা উৎসাহের সাথে সেই অনুষ্ঠান দেখতে এল । মেলায় একটি নাটক মঞ্চস্থ হয় নাম ''স্বামী গর্ভবান হয়েছে ।'' নাটকে মূল ঘটনা একটি ছেলের আকস্মিকভাবে গর্ভসঞ্চার হয়েছে । এমতাবস্থায় ছেলেটি বমি করছে । তার পা ফুলেছে, পেটে ব্যাথা করছে । এত কষ্ট সহ্য করেও সে স্বাভাবিকভাবে শিশুর জন্ম দিতে অশক্ত হল । তখন সিজার করে তার গর্ভ থেকে একটি কণ্যা শিশু বের করা হয় । নাটকটি এত জনপ্রিয় হবে চিন্তা করা যায় নি । এক গ্রাম থেকে পরের গ্রামে নাটকটি মঞ্চস্থ হলে আগের গ্রামের বেশ কিছু লোক সেখানে ভিড় জমায় । তাদের পুণরায় আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে ''নাটকটি চলাকালীন গ্রামের বাইরে ছিলাম । বাড়ীর সবাই বলল নাটকটি দারুন হয়েছে তাই দেখতে এসেছি ।'' এক স্থানীয় মন্ত্রী যখন দেখলেন বহু সংখ্যক মহিলা ঐ নাটক দেখছে তখন প্রস্তাব দিলেন নাটকটার নাম রাখা হোক ''মন্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন ।'' মন্ত্রীর ভূমিকায় তিনি নিজে নামবেন ।

এইভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য গ্রামের মহিলাদের কাছে পৌঁছাতে শুরু করল । গ্রামের মেয়েরা বলে, ''আমাদের অনেক ধরনের শারীরিক অসুবিধা আছে, কিন্তু কি করব? বড়জোর কোন বয়স্ক মহিলার কানে কানে জানাতে পারি, আমাদের সাদাস্রাব হচ্ছে

না, পেটব্যাথা করছে । খোলাখুলি কারও সামনে এ ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ নেই । তাছাড়া এসবের চিকিৎসা করার সুযোগও নেই ।''

সত্যিই তো কোথায় যাবে এরা? গ্রামে চিকিৎসার সুব্যাবস্থা নেই । চিকিৎসকরা গ্রামে যেতে চান না । প্রতিটি গ্রামে দু একজন করে ধাইমা আছে যারা বাচ্চা প্রসব করায় । এদের একটু একটু করে চিকিৎসাপদ্ধতি বোঝাতে লাগলাম । পঞ্চাশটি গ্রামের ধাইমাদের এনে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হল । এদের ক্লাসরুমে বসিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে না । আমরা নাচ, গান এবং নির্বাক নাটকের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষিত করা শুরু করি । কয়েক মাস লাগল শুধু তাদের ঠিকমত গ্লাভস পরা শেখাতে । কি ধরনের তথ্য তারা গ্রামের মহিলাদের কাছে পৌঁছে দেবে? কিভাবে তাদের সেবা করবে, বাচ্চার জন্ম দেওয়ার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকটা দেখবে, ছোটখাটো স্ত্রীরোগ জনিত রোগগুলো কিভাবে সঠিক চিকিৎসা করবে? প্রশিক্ষিত ধাইমারা শিবিরটির শেষে এক ব্যাগ ওষুধ নিয়ে মহাখুশিতে গ্রামে ফিরে গেল ।

আজ বারো বছর ধরে এইসব ধাইমা আমাদের সাথে কাজ করছে । এরা কেউ পয়সা পায় না তবু আসে । কোন অতিথি 'সার্চে' এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'আসি কারণ এখান থেকে সম্মান পাই' । একবার এক চিকিৎসক বারংবার প্রশ্ন করেছিলেন, ''আস কেন এখানে? টাকা পয়সা দেয় না, জামাকাপড় দেয় না তবু কেন আসছ?''
একসময় বুড়ো ধাইমা রেগে গিয়ে চিকিৎসকটিকে পাল্টা প্রশ্ন করে, ''তোমার বউ আছে?''
''আছে ।''
''সে কি মাঝে মাঝে তার বাপের বাড়ি যায়?''
''যায়তো ।''
''কেন যায়? ওখানে কি পয়সা পায়? পায় না তো । আমাদের ব্যাপারটাও তাই । বাপের বাড়ির মত এই জায়গা আমাদের প্রিয় ।''
গ্রামের ধাইমারা রানীর কাছে অনেক কিছু শেখে । ওদের মধ্যে একজন রানীকে বলে,
''আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছ । এবার তোমাকে কিছু শেখাই?''
''কি শেখাবে?'' রানী জানতে চায় ।
''কেমন ভাবে বরকে পেটাতে হয় । শেখাব?''
রানী অবাক হয়, ''খমকা কেউ নিজের বরকে মারতে যাবে কেন?''
''খামকা নয় তেমন পরিস্থিতি এলে । বর যদি মদ্যপ হয়, মার খেতে হবে । যদি কোন মহিলা অন্য পুরুষের সাথে জড়িয়ে পড়ে তবে বরকে ভাল লাগে না । তখনও মারতে পারে । শিখতে চাও তো শেখাব ।''
-

সৌভাগ্যবশত রানী এই কলার তালিম নেয় নি । কিন্তু ঘটনটা বলতে একটু হতাশ হয়েছিলাম বৈকি । এরা রানীকে ভেষজ বৃক্ষের হদিশ এনে দিতে পারত । তা না করে বরকে পেটানোর তালিম দিতে এসেছে । পরে অবশ্য আমাদের আক্ষেপ মিটে যায় । রানী প্রায় দু বাক্স ভর্তি ভেষজ সম্পদ এই মহিলাদের থেকে জোগাড় করল ।

বনে অন্তত তিনশটি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ আছে যেগুলো গ্রামের মানুষ কাজে লাগায় । তারা ওষুধ বানাতে, দড়ি বানাতে, রান্না করতে এসব গাছ কাজে লাগায় । এই সকল গাছ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য 'গোয়ীন' নামে বইটিতে প্রকাশিত । গাদচিরোলি ভাষায় গোয়ীন মানে বন্ধু । গ্রামীন মহিলাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু তো গাছ ।

গাছ ছাড়াও আরও একটি সম্পদ বিশেষ শব্দ শেখা । অন্যান্য গ্রামের মহিলারা যারা মারাঠী ভাষায় কথা বলত তারা স্ত্রী জনন অঙ্গ এবং জনন প্রক্রিয়ার অসুবিধার কথা বলতে গিয়ে বেশ কিছু নিজস্ব শব্দ ব্যাবহার করত । এগুলো জনসমক্ষে বলা হত না বলে তাদের কাছে অশ্লীল মনে হত । রানী সেসব শব্দ শেখে এবং মেয়েদের চিন্তাধারা, ব্যাবহার ও কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে । 'কানোসা' নামের একটি পুস্তকে শব্দগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষিত লোকজন কিছুটা আপত্তি জানায় । সেই পুস্তক পাঠের অযোগ্য তাই ঘরের মহিলাদের সেই পুস্তক পড়তে দিয়েছে । যখন প্রথমবার দলিত সাহিত্য জনসমক্ষে আসে তখন অনেক শব্দ এবং তাদের ব্যাবহারিক অর্থ নিয়ে তোলপাড় পড়ে গেল । নারীর গোপন অঙ্গ সম্বন্ধিত এই সব শব্দ প্রথম 'কানোসা' বইতে ছাপা হয় । তবে দলিত সাহিত্য প্রকাশিত হওয়ার পর একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল । দুটো গ্রাম থেকে বেশ কিছু লোক এসে অনুরোধ জানাল, ''স্ত্রীরোগ জনিত সমস্যার উপর আপনারা যেমন গবেষণা করেছেন তেমন পুরুষদের উপর করুন না । আমরাও প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে রয়েছি । কাউকে জানাতে পারছি না ।'' চিকিৎসাজনিত গবেষণার পক্ষে এমন প্রস্তাব প্রায় স্বপ্নের মত । খুব শিগগিরি আমরা এর কারণ অনুসন্ধান করতে সক্ষম হলাম । গ্রামের বেশীরভাগ পুরুষের পা অস্বাভাবিক ভাবে ফোলা ঠিক হাতির পায়ের আকার । এই এলিফ্যান্টাসিস রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখা গেল অন্তত ২৫ শতাংশ পুরুষ হাইড্রোসিলের শিকার । তারা কাপড়ের আড়ালে তাদের স্ফীত, অস্বাভাবিক আকৃতির স্ক্রোটাম লুকিয়ে রাখে । এ সম্পর্কে সমীক্ষা চলার পর হাইড্রোসিল অপারেশন শুরু হয় । যখনই কোন অপারেশন ক্যাম্প বসে লম্বা লাইন পড়ে যায় । চন্দ্রপুর থেকে ডঃ সালফালে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডঃ মাদ্দিওয়ার নিয়মিত এই ক্যাম্পে আসতেন ।

একদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় সোধগ্রামে ফিরছি । বাইরে তুমুল বৃষ্টি, পথঘাট অন্ধকার । এমনসময় দুজন স্ত্রীলোক হাজির হল । ওদের মধ্যে যার অল্প বয়স তার কোলে ছোট বাচ্চা, শিশুটি হাড় সর্বস্ব, চর্মসার, দেখতে ঠিক জ্যান্ত মমির মত । বাচ্চার খিঁচুনি ধরে গেছে । আমি খাটের উপর তাকে শুইয়ে বুকে স্টেথোস্কোপ লাগাতে ধক্‌ধক্ শব্দ শুনতে পেলাম । নিউমোনিয়া হয়েছে । কিছু করার আগেই তার বুকের ধুকপুকুনি চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেল । জিজ্ঞাসা করি, ''এত দেরীতে ওকে নিয়ে এলে কেন?'' এরা পাশের গ্রামে থাকে । বংশের বড় ছেলেটি দুর্ঘটনায় মারা যায় । বউটি পুণরায় সন্তানসম্ভবা হতে পরিবারে আনন্দের ঢল নেমে এসেছিল । মহিলার স্বামী মদ্যপ এবং সে নিজে দিনমজুরীর কাজ করে । বাচ্চাটি প্রসবাবস্থায় অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় । গ্রামের নিয়ম অনুযায়ী জন্মের তিনদিন পর্যন্ত বাচ্চাকে দুধ দেওয়া হয়নি । পরে মায়ের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল । বাচ্চাটি খিদের

জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে গলা ধরিয়ে ফেলে । বাধ্য হয়ে বোতলে খাওয়াতে হল । কেনা দুধ অনেকটা সাদা জলের মত । খেলে বাচ্চার খিদে মিটত না । বোতলটির মুখ বোধহয় ভালভাবে পরিষ্কার হয়নি । বাচ্চাটির ডাইরিয়া হয়ে যায় । গ্রামের কয়েকটি জ্ঞানী লোক তাবিজ লাগিয়ে, জলপোড়া খাওয়াতে বলে । দুধ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাচ্চাটি একদম দুর্বল হয়ে পড়ে । তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেনি । মায়ের ম্যালেরিয়া ছিল, বাচ্চাটির নিউমোনিয়া হয় । তারা ভগৎভুবার কাছে যায় । ভগৎভুবা গ্রামের ওঝা । তিনি একটি মোরগ মেরে মন্ত্র পড়েন তাতেও বাচ্চাটি ঠিক হল না । শেষপর্যন্ত ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায় । তাদের গ্রাম আমার ডিসপেনসরি থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে কিন্তু বর্ষায় চারিদিকে জল থইথই করছে । নদীতে প্লাবন এসেছে । জল কিছু কমতে ওকে নিয়ে এসেছে । ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে । মৃত বাচ্চার ঘটনাটি আমাদের কাছে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ । বাচ্চাটি জন্মাব্ধি দুর্বল ছিল । গর্ভাবস্থায় মায়ের অপুষ্টি তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল । বাচ্চার প্রসবকালে যন্ত্রনা হবে এই ভেবে মহিলারা কম খায় । জন্মের পর তিনদিন বাচ্চাটি কিছু খায় নি । তারপর ডাইরিয়া । বাড়ির লোক ঠিক সময় ডাক্তারের কাছে যেতে পারেনি । মোট আঠারোটি বিভিন্ন কারণ বাচ্চাটির মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছে ।

আর কতদিন ভারতবর্ষের মানুষ এই হতদশার মধ্যে পড়ে থাকবে? কবেই বা আঠারটি সমস্যার সঠিক সমাধান হবে? কবে ভারতের মহিলারা শিক্ষার আলো দেখবে? পেট ভরে খেতে পাবে? ম্যালেরিয়ার মরণকামড় থেকে মুক্তি পাবে? সব সমস্যা একসাথে দূর হওয়া সম্ভব নয় । তার প্রয়োজনও নেই । এর মধ্যে যেকোন একটি সমাধান হলে গোটা সমস্যাশৃঙ্খল ভেঙে পড়বে । যদি মহিলাটি শিক্ষিত হত, যদি তার স্বামী মদ খাওয়া ছাড়ত, যদি তার অন্ধবিশ্বাস দুরীভূত হত, স্বাস্থ্য সেবা সাধ্যের অনুকুল হত, নদীর উপর সেতু নির্মান হত, তবে বোধহয় শিশুটিকে বাঁচানো যেত । শিশু মৃত্যু হ্রাস তবে কিভাবে সম্ভব? গবেষণা শুরু করলাম । সমস্ত গ্রাম আমাদের গবেষণাকেন্দ্র । সেইসব গ্রামে প্রতিটি শিশুর জন্ম ও মৃত্যু তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল । প্রায় চল্লিশ হাজার শিশু নিউমোনিয়া রোগে মারা যায় । এ রোগের চিকিৎসা শুরু করার আগে সর্বপ্রথম প্রয়োজন এক্স রে মেশিন যা গ্রামে নেই । এমনকি স্টেথোস্কোপ বা ডাক্তারও সব গ্রামে মেলে না । কি করা যায় । নিউমোনিয়ার মূল লক্ষণ অসম্ভব কাশি, সর্দি, কফ । কিভাবে নিশ্চিত হব যে ঘনঘন কাশি মানেই নিউমোনিয়া হবে? প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক পাঠানোও অসুবিধাজনক । পাপুয়া নিউ গিনির ডাক্তার ফ্রাঙ্ক খুব সহজ একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । বাচ্চার প্রশ্বাস যদি মিনিটে ৫০ থেকে ৬০ হয় তবে তা নিউমোনিয়ার লক্ষণ । এই পদ্ধতিতে স্টেথোস্কোপ বা এক্স রে মেশিন ছাড়াই নিউমোনিয়া নির্ণয় করা যায় । সমস্যা তবু আছে । বাচ্চার বাবা মা সামান্য কাশি এবং নিউমোনিয়ার মধ্যে পার্থক্য করবে কি করে? এত সব করার পরেও যদি শিশুমৃত্যু না কমে? আমরা একশ চারটে গ্রামে আমাদের গবেষণা শুরু করি । ঠিক করলাম প্রতি গ্রামে অর্ধেক লোক চিকিৎসা পাবে । বাকিদের আমরা ওষুধ দেব না তারা সরকারী

সেবার আওতায় আসবে । আমরা বাচ্চাদের বাবা মাকে তথ্য দিতে শুরু করলাম । কিভাবে বাচ্চারা অসুস্থ হলে এরা বুঝবে সেটি নিউমোনিয়া । আমরা তাদের ভাষায় বললাম যদি কারও 'লাহক' বা 'ধাপা' হয় তবে তার 'দাব্বা' হতে পারে এবং তার চিকিৎসা প্রয়োজন । পোস্টার তৈরী করলাম । এরপর প্রতিটি গ্রামে একজন আরোগ্যদূত ঠিক করা হল । এরা মোটামুটি পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে । এদের প্রশ্বাসগননা শেখান হল । যদি দুমাস বা তার কম বয়সী শিশু মিনিটে ষাট বা তার বেশী প্রশ্বাস নেয় তবে বুঝতে হবে শিশুটির নিউমোনিয়া হয়েছে । শিক্ষিত ছেলেদের পক্ষে গণণা দুঃসাধ্য নয় । কিন্তু অশিক্ষিত ধাইমারা কিভাবে গুণবে? তারা ৫০ পর্যন্ত গুনতে জানে না । তবে তারা ১২ পর্যন্ত গুনতে পারে এবং ডজনের গুণিতকে হিসাব দিতে পারে । তাদের কথা মাথায় রেখে প্রশ্বাস গণণ যন্ত্র তৈরী করা হল । একটি বালুঘড়ি, এক মিনিটের মাথায় যার উপরার্ধ গোলকের সব বালুকণা নীচে পড়বে । তাছাড়া দুটি আণুভূমিক দণ্ড, উপরের দণ্ডে চরটে সবুজ ও একটি লাল এবং নীচের দণ্ডে পাঁচটা সবুজ ও একটি লাল বল আটকানো । বালুঘড়ি উল্টে দেওয়ার পর সময় গণণা শুরু হবে । দশটি প্রশ্বাসের পর একটি করে বল বাঁদিক থেকে ডানদিকে সরবে । দুমাসের অধিক বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বালুঘড়ির বালি উপরের গোলক থেকে নীচে পড়ার আগেই যদি উপরের দণ্ডের সবকটি গোলক ডানদিকে সরে যায় তবে ধরে নিতে হবে বাচ্চাটির নিউমোনিয়া হয়েছে । দুমাসের কম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নীচের দন্তে যদি ওই একই প্রক্রিয়ায় মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ছটি বল ডানদিকে সরে যায় তবে ধরে নিতে হবে নিউমোনিয়া হয়েছে । ধাইমাদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হলে বিভিন্ন বাচ্চাদের তাদের পরীক্ষা করতে দিলাম । শতকরা ৮২ ভাগ ক্ষেত্রে তাদের পরীক্ষার ফল আমার স্টেথোস্কোপের সাথে একমত হল । এইভাবে নিউমোনিয়া নির্ণয় করার পর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে তা সারাবার বন্দোবস্ত চলল । খুব মনোযোগ সহকারে জন্ম ও মৃত্যু হার রেকর্ড করলাম । গ্রামে যেসব পরিবারে চিকিৎসা হয়নি সেখানে মৃত্যুর হার ১২ শতাংশ অন্যদিকে যারা চিকিৎসার সুযোগ নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ০.৮ শতাংশ । গত বারো বছর ধরে আমাদের আরোগ্যদূতরা এইভাবে প্রায় ছহাজার শিশুর চিকিৎসা করছে । আমরা সমস্ত নথি সংগ্রহ করে কম্পিউটারে রাখলাম । মৃত্যু হার কমে প্রায় ০.৫ শতাংশ দাঁড়াল অর্থাৎ আমরা সাফল্যের সাথে ৯৯.৫ শতাংশ মৃত্যুহার কমাতে পেরেছি । শুধুমাত্র নিরক্ষর ধাইমা এবং অর্ধশিক্ষিত আরোগ্যদূতদের সাহায্যে । নিউমোনিয়া দূর করা গেল । নিউমোনিয়ার ফলে শিশুমৃত্যুর হার প্রায় ৭৪ শতাংশ হ্রাস পেল এবং সমগ্র শিশুমৃত্যুর হার ২৫ শতাংশ হ্রাস পেল ।

আমাদের নিওন্যাটাল হেলথ কেয়ারের দ্বিতীয় ভিত্তিস্তম্ভ ছিল গ্রামের ধাইমা । ধাইমা সর্বপ্রথম নবজাতকের কাছে আসে । তৃতীয় ভিত্তিপ্রস্তর নগ্নপদী স্বাস্থ্যকর্মী । তাদের অসুস্থ বাচ্চাকে পরিচর্যা করার জন্য রাখা হয়েছে । প্রথমে তারা পুতুলদের নিয়ে অনুশীলন করলেন । যদি নবজাতকের শ্বাসকষ্ট হয় তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার শ্বাস স্বাভাবিক না হলে তার মৃত্যু হতে পারে । নল এবং মুখোশ ব্যবহার করে কিভাবে তাকে কৃত্রিম শ্বাস দিতে হবে তা

আরোগ্যদূতদের শেখান হল । গ্রামে শিশুকে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই । ফলে তার ঠাণ্ডা লাগে । দুর্বল শিশুদের স্লিপিং ব্যাগে পুরে কম্বলে দিয়ে জড়িয়ে মায়ের কোলে দিতে হয় । বড় বড় হাসপাতালে ইনকিউবেটর থাকে । এখানে এই কম্বল জড়ানো স্লিপিং ব্যাগ হল ঘরোয়া ইনকিউবেটর । শতকরা পঞ্চাশভাগ শিশুমৃত্যু ইনফেকশন থেকে হয় । পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ইনফেকশনকে কাছে ঘেষতে দেয় না । যদি সত্যিই এটা এড়ান না যায় তবে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে । আরোগ্যদূতদের শেখান হল কিভাবে সহজ প্রক্রিয়ায় অ্যান্টোবায়োটিক দেওয়ার পূর্বাবস্থা জানা যায় । কখন প্রয়োজনীয় জেটামাইসিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে । সমস্ত প্রস্তুতি সমাপ্ত হলে আমরা দেশের দশজন বরিষ্ট শিশুরোগবিশেষঞ্জ দলকে সোধগ্রামে আমন্ত্রন জানালাম অগ্রদুতদের পরীক্ষা করতে । বিশেষঞ্জরা ছিলেন অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সের ডঃ মেহেরবান সিনহ্, মুম্বাইয়ের এশিয়ান কংগ্রেস অফ পিডিয়াট্রিক্সের সভাপতি ডঃ রমেশ পোদ্দর প্রমুখ । দশজনের এই বিশেষঞ্জ দল তিনদিন ধরে পরীক্ষা করে আরোগ্যদূতদের সার্টিফিকেট দিলেন । ডঃ মেহেরবান এদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দিয়ে বললেন এইসব গ্রামীন স্বাস্থ্যকর্মীরা মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটদের থেকে বেশী নবজাতক পরিসেবা জানে । কমিটির তরফ থেকে অপরিমেয় আশীর্বাদ এবং সবুজ সংকেত সঙ্গী করে আরোগ্যদূতরা কাজ শুরু করল । ইনফেকশনের চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগে শিশুমৃত্যুর হার ছিল শতকরা ১৭ ভাগ, সঠিক ওষুধ এবং ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর সেই হার কমে দাঁড়াল ২.৮ শতাংশ । আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রশিক্ষণের কোন অপব্যবহার করেনি । পরিস্থিতি যেমনি দাবী করেছে ঠিক সেই রূপ তারা চিকিৎসা চালিয়েছে । বস্টনের নিওন্যাটাল নার্সারীতে ৬ শতাংশ শিশুকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় । সমপরিমাণ শিশুকে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে । এই চিকিৎসায় কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে কি? এখনও পর্যন্ত আমাদের নগ্নপদী সেবিকারা তিনহাজার ইঞ্জেকশন দিয়েছে । পরবর্তীকালে সেইসব শিশুর বাড়ির লোকজন কোন অসুবিধার উল্লেখ করেনি ।

আমাদের গবেষণামূলক কর্মধারার ফলস্বরূপ দেখা গেল যেসব গ্রামে আরোগ্যদূতরা চিকিৎসা শুরু করেনি সেখানের শিশু মৃত্যুর হার আগের মতই আছে অথচ বাকীগুলোয় গত তিনবছরে এই হার কমে ৬০ থেকে ২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের এই গবেষণা সাদরে গৃহীত হয়েছে । হু এর কর্মকর্তারা এতদিন ধরে মেনে এসেছেন নবজাতক অসুস্থ হলে তাকে ঘরে ফেলে না রেখে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রয়োজন । আমাদের গবেষণা প্রমাণ করল সঠিক ভাবে যত্ন নিয়ে তাকে ঘরে রেখেই চিকিৎসা করা যায় । আমাদের এই নতুন পদ্ধতির কতটা ব্যয়সাপেক্ষ? সাধারণ ভাবে প্রতিটি নবজাতকের জন্য খরচ ২৫০ টাকা, প্রতিগ্রামের জন্য খরচ হয় ৮০০০ টাকা । এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রতিটি বাচ্চার জীবন বাঁচাতে খরচ হয় ৫০০০ টাকা । প্রতিটি শিশু যদি ৬০ বছর বাঁচে তাহলে বছর প্রতি সে আয়ুর মূল্য মাত্র ৮০ টাকা । একটি জনজীবন বাঁচাতে প্রতি বছর কত পরিমাণ খরচ হয় তা জানতে হু এর কর্মকর্তারা বিভিন্ন জনস্বাস্থ্যমূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করল ।

সনাতন চিকিৎসায় একটি মানুষের এক বছর আয়ুমূল্য ১৫০০ থেকে ২৫০০ টাকা, আর গাদচিরোলিতে মাত্র ৮০ টাকায় তা সম্ভব । অর্থাৎ নতুন চিকিৎসাব্যবস্থা স্বল্পব্যয়ী এবং অধিক ফলদায়ী ।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ল্যানসেট জার্নালে আমাদের গবেষণা প্রকাশিত হল । পেপারটি বিশ্বের তাবড় তাবড় বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করল । গবেষণাটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সুদূরপ্রসারী করার জন্য 'হু' এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটা আলোচোনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল । ভারতসরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের পক্ষ থেকে গাদচিরোলির চিকিৎসাপদ্ধতি ভারতে সমস্ত গ্রামে চালু করার বিরাট যোজনা অধিগৃহীত হয়েছে । এই ধরণের শিশু চিকিৎসা পদ্ধতি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহার করার জন্য বিল গেটস্ ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে ''সেভ দ্য চাইল্ড'' নামক এক আন্তর্যাতিক সংস্থাকে ২৪০ কোটি টাকার অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছে । গবেষণা হল একটি ছোট জায়গায় এবং তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল । সরল গ্রাম্য মহিলারা সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই মিরাকেল করে দেখাল । মাত্র কয়েকটি মামুলি যন্ত্র, বাচ্চাদের ওজন পরিমাপযন্ত্র, টিউব, মাস্ক, থার্মোমিটার, সিরিঞ্জ, সূচ এবং মিউকাস অ্যাসপিরেটর সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বয়ে প্রতিটি শিশুর চিকিৎসা করল । ১৯৮৮ সালে আমরা শিশুমৃত্যুর উপর কাজ শুরু করলাম । সেই সময় সামগ্রিক শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজার প্রতি ৩০ জন । যেখানে শতকরা ৭০ শতাংশ মহিলা নিরক্ষর এবং হাসপাতালে ডাক্তার মেলে না সেখানে শুভক্ষণের কথা চিন্তা করাটা বোকামী । গ্রামীণ মহিলাদের কাজে লাগিয়ে যে প্রচেষ্টা আমরা শুরু করেছি তা বিশ্বের যে কোন দেশে শুরু করা যায় । যে কোন গবেষণার মূল শক্তি হল অভিনবত্ব । আর্কিমিডিস বলতেন, ''আমার প্রয়োজনমত লম্বা দণ্ড যদি দেওয়া হয় তবে পৃথিবী নাড়িয়ে দেব ।'' আলউইন টফলর বলেন, ''বিংশ এবং একবিংশ শতকে সম্পদ ও শক্তির উৎসদ্বার জ্ঞান এবং তথ্য । এই জ্ঞানের যুগে যে যত বেশী তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহ করবে সে তত বেশী শক্তিশালী । সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক কাজকর্মের রীতিতেও বদল আসা প্রয়োজন । যৌথ স্বাস্থ্যসেবার কল্যাণে একজায়গায় একটা রোগীর পরিবর্তে হাজার রোগীর চিকিৎসা চলছে । কোটি কোটি মানুষ এই ব্যবস্থায় উপকার পাবে ।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারতবর্ষের মানুষকে সাবধান করা । প্রবাসী ভারতীয়রা মধ্যবিত্ত মহারাষ্ট্র পরিবারে ভীষন প্রভাব ফেলেছে । আমেরিকার জীবনযাত্রার অন্ধ অনুকরণ করে বহুমানুষ জীব ও জাতির সর্বনাশ ডেকে আনছে । তারা ভাবে অসফল মানুষ নিজেদের দুঃখ নিজেরাই ডেকে আনে । কিন্তু যে প্রকৃত সম্পদের অধিকারী সে বলে এই অন্ধ অনুকরণ প্রকৃত সুখ অনয়ন করে না । আমেরিকায় সব সুখ গচ্ছিত আছে এটা ভাবা ভুল । বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আর. কে লক্ষণের একটি কার্টুনে ছিল হিমালয়ের নির্জনতায় লম্বা দাড়িওয়ালা একজন সাধু বসে আছেন । এক সাংবাদিক তার হেলিকপ্টারে করে সেখানে এসে নামে । সাধুটিকে জিঞ্জাসা করে, 'বাবা শান্তি কোথায় মিলবে ।''
সাধু তার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকেন, ''জানব কি করে বৎস, আমি যে আমেরিকান ।''

গবেষণা হল একটি ছোট জায়গায় এবং তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল । সরল গ্রাম্য মহিলারা সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই মিরাকেল করে দেখাল । মাত্র কয়েকটি মামুলি যন্ত্র, বাচ্চাদের ওজন পরিমাপযন্ত্র, টিউব, মাস্ক, থার্মোমিটার, সিরিঞ্জ, সূচ এবং মিউকাস অ্যাসপিরেটর সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বয়ে প্রতিটি শিশুর চিকিৎসা করল ।

১৯৮৮ সালে আমরা শিশুমৃত্যুর উপর কাজ শুরু করলাম । সেই সময় সামগ্রিক শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজার প্রতি ৩০ জন । যেখানে শতকরা ৭০ শতাংশ মহিলা নিরক্ষর এবং হাসপাতালে ডাক্তার মেলে না সেখানে শুভক্ষণের কথা চিন্তা করাটা বোকামী । গ্রামীণ মহিলাদের কাজে লাগিয়ে যে প্রচেষ্টা আমরা শুরু করেছি তা বিশ্বের যে কোন দেশে শুরু করা যায় ।

যে কোন গবেষণার মূল শক্তি হল অভিনবত্ব । আর্কিমিডিস বলতেন, ''আমার প্রয়োজনমত লম্বা দণ্ড যদি দেওয়া হয় তবে পৃথিবী নাড়িয়ে দেব ।'' আনউইন টফলর বলেন, ''বিংশ এবং একবিংশ শতকে সম্পদ ও শক্তির উৎসদ্বার জ্ঞান এবং তথ্য ।'' এই জ্ঞানের যুগে যে যত বেশী তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহ করবে সে তত বেশী শক্তিশালী । সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক কাজকর্মের রীতিতেও বদল আসা প্রয়োজন । যৌথ স্বাস্থ্যসেবার কল্যাণে একজায়গায় একটা রোগীর পরিবর্তে হাজার রোগীর চিকিৎসা চলছে । কোটি কোটি মানুষ এই ব্যবস্থায় উপকার পাবে ।

সংক্ষেপে যতটা সম্ভব ভোগের সামগ্রী কম করে কিছুটা ত্যাগ করুন । আমেরিকা এবং কানাডার বুকে 'ফ্রেণ্ডস অফ চিলড্রেন ইন মহারাষ্ট্র' নামের একটি সংস্থা চালু করা যায় । প্রবাসী মহারাষ্ট্রের মানুষ প্রতি বছর যে কোন সময় অন্তত কিছুদিনের জন্য এসে তাদের সময় ও মেধা ওখানকার দুঃস্থ অসহায় শিশুগুলোর জন্য দিতে পারেন । একটি বাচ্চাকে বাঁচাতে মাত্র ৯৭ ডলার খরচ হয় । এটুকু নিশ্চয় দেওয়া যায় । কেউ কেউ প্রশ্ন করবেন, ''এতো বিশাল কর্মযজ্ঞ । একটি শিশুকে বাঁচিয়ে কি এমন উন্নতি হয়?'' একবার বড় আকারের ঝঞ্ঝাবত্যায়ের ফলে প্রচুর সংখ্যক মাছ বালুকাবেলায় প্রোথিত হল । তারা সাগরে ফেরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে । এক সন্ন্যাসী তা দেখতে পেয়ে একটার পর একটা মাছ তুলে জলে ছেড়ে দিচ্ছেন । তা দেখে আরেক সন্যাসী জিজ্ঞাসা করেন, ''কটা মাছ জলে ছেড়ে কি পার্থক্য হবে?''

অপরজন জবাবে আরও একটি মাছ জলে ছুঁড়ে দিলেন । মাছটি সাঁতার কাটতে কাটতে জলের তলায় অদৃশ্য হল । সেদিকে আঙ্গুল তুলে তিনি বললেন, ''অন্তত এ মাছটির জীবনে পার্থক্য আনল তো?''
বন্ধুগন আপনারা সত্যিই পরিবর্তন আনতে পারেন ।